বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয়[১]

ড. শাহদীন মালিক, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

ভূমিকা

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিচার বিভাগ, নির্বাহী ও আইন বিভাগ থেকে পৃথক হতে হবে। একইসঙ্গে বিচার কার্যে বিচার বিভাগের থাকতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

আমরা স্বাধীনতার চার দশক পরেও এখনো প্রায় প্রতিনিয়ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছি এবং যে আলাপ-আলোচনা আমরা করছি তার প্রায় সবটাই সমালোচনা-ধর্মী। অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন আছে। স্বস্তি নেই, আছে উৎকণ্ঠা।

১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগ ছিল নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নিম্ন আদালতের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক দায়ভার, নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ন্যস্ত ছিল সুপ্রিম কোর্টের উপর। কিন্তু ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পৃথকতা উভয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পথে বিচার বিভাগ যাতে অন্তরায় না হতে পারে সেই যুক্তিতে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বরখাস্ত, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি সব ক্ষমতাই ন্যস্ত করা হয় একচ্ছত্রভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর। এমনকি ৯৬(৩) অনুচ্ছেদের বিচারপতিদের অব্যহতি সংক্রান্ত সংসদের আইন করার যে ক্ষমতার উল্লেখ ছিল সেটার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। অর্থাৎ বিচারপতিদের ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন শুধু এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি।

১৯৭৫ এ বিচারপতিদের স্বাধীনতা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করার যে অধ্যায় সেখান থেকে গত ৪০ বছরে (১৯৭৬ থেকে ২০১৬) আমাদের যাত্রা ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত যে বিধি-বিধান ছিল সেটা পুনরুদ্ধার বা শুরুর পর্যায়ে ফিরে যাবার যাত্রা। তবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার যে বিধান ছিল সেখানে আমরা এখনো সম্পূর্ণ ফিরে যেতে পারি নাই।

১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া

অনুচ্ছেদ ৯৬(৩):

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ষষ্ঠ ভাগের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পৃথকীকরণ ব্যাপকভাবে সঙ্কুচিত হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ৯৫, ৯৬, ১০২, ১০৯, ১১৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়।

আমাদের সংবিধানের সর্বশেষ অর্থাৎ ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কিন্তু কাজ কিছু বাকি পড়ে আছে। সংসদকে বিচারপতিদের অপসারণের পদ্ধতি ও তদন্ত আইন পাশ করতে হবে। এই আইন করার বিধান ১৯৭২ এ ছিল, ১৯৭৫ এ তা বিলুপ্ত হয়। আর এখন ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে অপসারণ সংক্রান্ত আইন করার ব্যাপারটা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এরমধ্যে কেটে গেছে প্রায় দেড় বছর। আইনটি এখনো হয় নাই। সংবিধানের ১৪৭ (২) অনুচ্ছেদে বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ অর্থাৎ 'সাংবিধানিক পদে' অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদের স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত হবার পর এমন কোনো আইন করা যাবে না, যার দ্বারা তাদের চাকরির শর্তাদিতে 'এমন তারতম্য করা যাইবে না যাহা তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।' ('Shall not be varied to their disadvantage...')। যে বিচারপতি, ধরুন, ২০১৩ সালে শপথ নিয়েছেন তখন, অর্থাৎ তাঁর শপথ নেয়ার সময় ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করার কথা ছিল প্রধান বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির পর অন্য দু'জন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি বা সব মিলিয়ে তিনজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির। এখন ৯৬(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন আইন করতে গিয়ে সেই নতুন আইনে অভিযোগের তদন্তের জন্য গঠিত কমিটি যদি তিনজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতির পরিবর্তে অন্য কারো দ্বারা গঠিত হয় তাহলে কোন বিচারপতি আপত্তি করতেই পারেন যে, এতে তাঁর কাজের শর্তাবলীর এমন পরিবর্তন করা হয়েছে যা তার জন্যে অসুবিধাজনক। অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তে তার যে আস্থা থাকতো অন্য কমিটির উপর সেই অবস্থা থাকবে না, তাহলে অন্য কোনো তদন্ত কমিটির বিধান রেখে প্রণীত আইন যে সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, তা থেকে উৎরে যাওয়া সহজ হবে না।

অনুচ্ছেদ ৯৫(২)(গ):

বিচার বিভাগ সংক্রান্ত যে আইনের কথা ১৯৭২ সালেই সংবিধানে বলা ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি হয়নি, তা হলো বিচারপতিদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন। ৯৫(২)(গ) তে বলা আছে যে, কোনো ব্যক্তির আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে বিচারপতি পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন

[১] এই শিরোনামে ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক আয়োজিত প্রেসক্লাবের গোলটেবিল আলোচনায় পঠিত মূল বক্তব্য।

না। ৪৪ বছর পার হয়ে গেল, সংসদ বিচারপতিদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে আইন পাশ করে নাই। এই সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিয়েছে বলে শোনা যায় না।

প্রভাষক, ডাক্তার, সহকারী কমিশনার-সহ রাষ্ট্রের ছোট-বড়, সব পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারিত আছে।

গত এক যুগের দলীয় সরকারের সময় নিজ দলের সমর্থক নয় অথবা অন্তত সহানুভূতিশীল নয় এমন কেউ বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাননি – দু'চারটা ব্যতিক্রম হয়তো আছে। গত একযুগে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১১ জন। প্রায় আশ্চার্য্যের ব্যাপার হলো প্রধান বিচারপতিগণ দায়িত্ব পালনকালে তাদের সময়ের সরকারি দলের বাইরে নিয়োগ দেবার যোগ্য কোনো আইনজীবীকেই খুঁজে পাননি। বিচারপতি নিযোগে প্রধান বিচারপতিদের এমন দলীয় পক্ষপাতিত্ব নিঃসন্দেহে অন্য কোন দেশে বিরল।

গত সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বিচারপতির যোগ্যতা সম্বলিত একটা অধ্যাদেশ জারি করা হয়। অধ্যাদেশটিতে সাংবিধানিক অসংগতি ছিল। যতদূর মনে পড়ে, আমিই চ্যালেঞ্জ করে রিট করেছিলাম এবং আদালত অধ্যাদেশটি অসাংবিধানিক বিবেচনায় বাতিল করে।

স্পষ্টত বিচারপতি নিয়োগে আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও সিলেকশন কমিটি নির্ধারণ করে দিলে যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে বিচারপতি নিয়োগ হলে দলীয়করণ বা 'নিজ লোক' নিয়োগের সুযোগ বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

যেহেতু দলগুলোর কাছে দেশ, জাতি, ন্যয়বিচার বা জনস্বার্থ থেকে দলীয় স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই বিচারপতি নিয়োগের আইন কোনো দলীয় সরকার পাশ করার আশা অতি ক্ষীণ। হয়তো আমাদের জন্য আইনের শাসন আসলেই সুদূর পরাহত।

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়াঃ

সুপ্রিম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে 'তদবিরভিত্তিক'। চাউর আছে বেশ কয়েক বছর আগে সুপ্রিম কোর্টে যখন গোটা পয়ত্রিশেক তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করা হয় তখন নাকি প্রায় ত্রিশ জনই নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন উক্ত সময়ের প্রধান বিচারপতির নিজ জেলার। কথা তাই বলে, 'যাহা রটে তাহা কিছুটাতো বটে'।

আমাদের আদালতগুলো তথা বিচার বিভাগের সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ এই তদবিরনির্ভর নিয়োগ। বিচারকরা যতই কর্ম দক্ষ, যোগ্য ও নিবেদিত প্রান হোক না কেন, তাদের কর্মচারী কর্মকর্তারা যদি অদক্ষ, অযোগ্য ও অসৎ হয় তাহলে বিচার ব্যবস্থা বিচার-বান্ধব হতে পারে না। বিচার বিভাগের দুর্নীতি সংক্রান্ত যেসব ধারণা প্রচলিত আছে তার জন্য এইসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি পরায়ণতা বহুলাংশে দায়ী। একজন বিচার প্রার্থীকে যখন আদালতের বিভিন্ন 'ঘাটে' উপরি অর্থ দিতে হয় তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই 'উপরি অর্থ' কর্মকর্তা-কর্মচারী না বিচারক পাচ্ছে তার সুক্ষাতিসুক্ষ বিশ্লেষণ একজন বিচার প্রার্থী করেন না। তার কাছে যেটা বাস্তবতা সেটা হলো 'কোর্টে' গেলে ঘুষ দিতে হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুধু যে স্বচ্ছ ও যোগ্যতাভিত্তিক করতে হবে তাই না, প্রয়োজনে অদক্ষ-অযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদায় করতে হবে। নতুন জাতীয় বেতন স্কেল এবং বিচার বিভাগীয় নতুন পে-স্কেল কার্যকর হবার পর বেতন-ভাতাদি কমবেশি দ্বিগুণ হবার কারণে এই নতুন পে-স্কেলের আওতায় অবসর ভাতাও দ্বিগুণ হবে। তাই এখন ২৫ বছর কর্মপূর্তিতে ১৯৭৪ সালের অবসর আইনের ৯(২) ধারা অধীনে অদক্ষ অযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর দিলে তাদের আর্থিক কোনো ক্ষতি হবে না এবং বিচার বিভাগে অদক্ষ-অযোগ্য কর্মকর্তাদের পরিবর্তে দক্ষ, বিশেষত আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী কর্মকর্তা নিয়োগ অত্যাবশ্যক।

আউট সোর্সিংঃ

নিয়োগ প্রক্রিয়া 'আউট সোর্সিং' বা 'সাবকন্ট্রাকটিং' না করলে, আবার তদবির বা দলীয় প্রভাবে নিয়োগ হলে, বা নিয়োগ-বাণিজ্য মুখ্য হয়ে পড়লে পুরো প্রক্রিয়াটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমার পরিবর্তে বাড়বে।

প্রশিক্ষণ

সার্বিক অদক্ষতা ও অযোগ্যতার প্রেক্ষাপটের কারণেই সম্ভবত বিচার ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ বা উচ্চতর যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের কোনো সুব্যবস্থা নেই বললেই চলে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ বিচারকরা জ্যেষ্ঠতর বিচারকের সাথে বা পাশে দিনের পর দিন বসে থাকে। বিচার শেখার যে ব্যবস্থা প্রায় দেড়শ বছর আগে ব্রিটিশ উপনৈবেশিক শাসকরা শিখিয়েছিলেন তা আজও হুবুহু অনুসরণ করা হচ্ছে। এই গত নভেম্বরে সর্বশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী বিচারকরা সারা দেশের বিভিন্ন এজলাসে অতিরিক্ত বা যুগ্ম জেলা জজের পাশের চেয়ারে এজলাসে বসে আছেন, এটাই ট্রেনিং। বছর খানেক পরে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সিটিউটে (JATI) তিন বা ছয় মাসের প্রশিক্ষণ। পরবর্তী ২৫ বছরের চাকরি জীবনে মাঝে মাঝে দুই/চার সপ্তাহের কয়েকটি দায়সারা প্রশিক্ষণ। বিদেশে উচ্চশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

সরকারের ডাক্তার, পুলিশ, সেনা বাহিনী, প্রশাসন, এমনকি মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাদের চাকরি জীবনে যে যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন বা হয়ে থাকেন, বিচার বিভাগের প্রশিক্ষণ সম্ভবত সেটার দশভাগের একভাগ। সেনাবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার ও মেজর জেনারেল পদমর্যাদার সেনা

কর্মকর্তারা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে বছরব্যাপী যে রেসিডেন্সিয়াল কোর্স করেন সেরকম অতিরিক্ত বা জেলা জজ পর্যায়ের বিচারকদের বৎসরব্যাপী কোর্স দরকার। তবে এরকম প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে, কেননা যারা কম জানে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বা বেশি জানার কথা শুনলে ভয় পায়। আর অজ্ঞতার খেসারত দিতে হয় বিচার প্রার্থী জনগণকে।

নিম্ন ও উচ্চ আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কিছু ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা নিঃসন্দেহে অপ্রতুল, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রয়োগ ইদানিং কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু 'যেতে হবে বহুদূর'।

আইনজীবীদের ব্যাপারটা অত্যন্ত ভয়াবহ। এই প্রেসক্লাব বা সুপ্রিম কোর্টের এক কিলোমিটারের মধ্যে ডাক্তারদের উচ্চশিক্ষার জন্য ডাক্তারি বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, মেডিসিন, ডায়াবেটিস, বিভিন্ন শৈল চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত অন্তত গোটা পঞ্চাশেক বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও ডিগ্রির ব্যবস্থা আছে। বারডেম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদালয়, ঢাকা মেডিকেলসহ প্রায় গোটা ছয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মোহাম্মদপুর, শেরে-বাংলা এবং মহাখালী এলাকায় আছে আরও আধা ডজন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

আইনজীবীদের জন্য নাই সারা দেশে বলতে গেলে একটিও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের জনা পনেরো পিএইচডি শিক্ষার্থী ব্যতীত।

পৃথকীকরণ

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত ছিল এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের উপর। ১৯৭৫ এর চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে পুরো নিয়ন্ত্রণটা চলে যায় রাষ্ট্রপতির কাছে। এখন চলছে দ্বৈত শাসন, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শ করে অধস্তন আদালতের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি শৃঙ্খলা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয় পৃথকীকরণ তথা স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। ইদানিং বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের 'পরামর্শ' বাস্তবায়ন করছে না বা অন্তত গড়িমসি করছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা। অর্থাৎ অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত থাকবে সুপ্রিম কোর্টের 'বিচার বিভাগীয় কার্যালয়' বা যথেষ্ট লোকবল সম্বলিত দেড় হাজার বিচারকের দেখভাল ও তাদের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত 'জনপ্রশাসন দপ্তর'। বিচারকদের প্রশাসনিক পরিচালনা সংক্রান্ত যে কাজটি এখন আইন মন্ত্রণালয় করে সেটা একজন 'রেজিস্ট্রার জেনারেল' এর অধীনে সুপ্রিম কোর্ট করবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা। অর্থাৎ অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ন্যাস্ত থাকবে সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় কার্যালয় বা যথেষ্ট লোকবল সম্বলিত দেড় হাজার বিচারকের দেখভাল ও তাদের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত জনপ্রশাসন দপ্তর। বিচারকের প্রশাসনিক পরচালনা সংক্রান্ত যে কাজটি এখন আইন মন্ত্রণালয় করে সেটা একজন রেজিস্টর জেনারেল এর অধীনে সুপ্রিম কোর্ট করবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে নির্বাহী বিবাগ থেকে বিচার বিভঅগকে সম্পূর্ণ আলাদা করা।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশেই এই প্রশাসনিক পৃথকীকরণ হয়ে গেছে। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ। সরকার এটা করতে চায় না, এদেশে যারা ক্ষমতায় যান – রাজনৈতিক বা সামরিক উভয়েই – তারা মনে করেন বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, থাকতে হবে। তাই চল্লিশ বছরেও বিচারপতি নিয়াগের আইন হয়নি। পৃথকীকরণ হয়নি। কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগের মূলমন্ত্র 'তদবির'। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ। সরকার এটা করতে চায় না, এদেশে যারা ক্ষমতায় যান রাজনৈতিক বা সামরিক উভয়েই তারা মনে করেন বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, থাকতে হবে। তাই চল্লিশ বছরেও বিচারপতি নিয়োগের আইন হয়নি।

বিচার ব্যবস্থার প্রধান বিচারপতিকেন্দ্রিক প্রশাসন

মাজদার হোসেন মামলার (১৯৯৯ সালের) রায়ের বাস্তবায়নে গত ১৬ বছরে বড় দাগে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গৃহীত হয়েছে:

(১) বিচারকদের প্রবেশ স্তরে অর্থাৎ সহকারী বিচারক পদে নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছে;

(২) ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য (বদলি, পদোন্নতি, ছুটি ইত্যাদি) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চারটি পৃথক বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে;

(৩) বিচার বিভাগের বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণের জন্য বিচার বিভাগীয় পে কমিশন গঠিত হয়েছে, যদিও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার নেতৃত্বে গঠিত সর্বশেষ পে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে;

(৪) অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, ছুটি ইত্যাদি ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শ করা হচ্ছে। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ উপেক্ষা করা হচ্ছে।

উপরের চারটির মধ্যে সর্বশেষ অর্থাৎ বিচারকদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্ট্রার অফিসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে এবং আইন মন্ত্রণালয়ের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কাজের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।

অধস্তন আদালতের উপর সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য একচ্ছত্রভাবে প্রধান বিচারপতিকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চ গঠন ও ক্ষমতা বণ্টনের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতি নিজে পালন করতে পারবেন অথবা সেই দায়িত্ব যে কোনো বিভাগের প্রবীনতম বিচারপতির উপর ন্যস্ত করতে পারবেন। এছাড়া প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু অদ্যাবধি এইসব কাজগুলো প্রধান বিচারপতি একক ও একচ্ছত্রভাবে করে থাকেন বিধায় বিচার প্রশাসনে একক কর্তৃত্ব বিরাজ করছে। প্রবীণতম বিচারপতি ও বিভিন্ন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটিগুলোর মাধ্যমে বিচার প্রশাসনকে গতিশীল করতে হবে।

যেহেতু বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত হবে, সেহেতু বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশের মত স্বল্প সংখ্যক বিচারপতিকে সার্বক্ষণিকভাবে শুধুমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ 'জজ-এ্যাডমিনিস্ট্রেটর' পদ তৈরি করতে হবে। সব বিচারপতি সারাদিন এজলাসে বসে বিচার করলে বিচার বিভাগ পৃথক তথা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে না।

মামলা জট

ইদানিং ৩০ লাখ মামলার জন্য যে জটের কথা বলা হচ্ছে সেটা বড় ধরনের সমস্যা নয়। সমাধানের পথ জানা না থাকায় এত মামলাকে বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জেলায় জেলায় গিয়ে বিচারকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বহু দেশ তাদের মামলা জটের সমস্যার সমাধান করেছে। ঐ সব দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচারক ও আইনজীবীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে এই সমস্যা সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব।

মনে রাখতে হবে কম্পিউটার সমস্যার সমাধান করে না, বক্তৃতায়ও সমাধান হয় না, প্রয়োজন দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তির সমন্বিত প্রচেষ্টা।

বাজেট

বড়দাগে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের জন্যে বরাদ্ধ হয়ে থাকে মোট বাজেটের ০.৩ থেকে ০.৪ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য এই বরাদ্ধ ০.৫ থেকে ০.৬ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্ধ ছিল ১,০৪৬ কোটি টাকা আর মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্ধ ছিল ১৪৬৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাছ ও পশু খাতের বাজেট বিচারক, কোর্ট-কাচারী ও আইনজীবীদের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশি।

একইভাবে গত অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটে আইন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্ধ ছিল ৩২৯ কোটি টাকা। মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্ধ ছিল ৭৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্র মাছ এবং পশুর উন্নয়নের জন্য আইন ও বিচারের উন্নয়নের চেয়ে খরচ করে প্রায় আড়াই গুণ বেশি অর্থ। সপ্তাহ তিনেক আগে সংবাদ মাধ্যমে খবর এসেছিল যে, মগবাজার-মালিবাগ ফ্লাইওভারের কিছুটা বাড়তি কাজ করার জন্য অতিরিক্ত ৪৩০ কোটি টাকার বর্ধিত ব্যয় অনুমোদিত হয়েছে। অর্থাৎ এক কিলোমিটার খানিক বর্ধিত ফ্লাইওভারের খরচ সারা বছরের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সব উন্নয়ন কাজের বরাদ্ধের চেয়ে ঢের বেশি।

উপসংহার

১. সংবিধানের ৯৫(২)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগের স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।
২. সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৫, ১১৬ প্রতিস্থাপন করে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. উপরোল্লেখিত ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বা বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।
৪. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতিকে সার্বক্ষণিকভাবে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।
৫. মামলার জট কমানো ও বিচার প্রার্থীদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য বার ও বেঞ্চের যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে।
৬. বিচারক-সহ বিচারবিভাগের সকল স্থরে কর্মকর্তাদের জন্যে অর্থপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. বাজেট বাড়াতে হবে।

তবে বাস্তবতা হলো, যে সরকারের ব্যাপক জনসমর্থন নেই; সংসদে সতিকারের বিরোধী দল নাই এবং সংসদ কার্যত অকার্যকর; নির্বাচন কমিশন যেখানে সরকারি দলকে জেতাতে ব্যস্ত; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও দুদকের অন্যতম প্রধান কাজ ভিন্ন দলের রাজনীতিবিদদের শায়েস্তা করা এবং সরকারের প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সেখানে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্যে প্রস্তাব করা যায়, কিন্তু এ ধরনের কোনো পদক্ষেপের বাস্তবায়নের প্রত্যাশা সুদূর পরাহত।